# হঠাৎ কেন

দেবাশিস সেনগুপ্ত



চরিত্রটির নাম নীপা। প্রায় পঞ্চাশ ছোঁয়া একজন অধ্যাপিকা। একা থকেন। একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে সবেমাত্র নতুন বাড়িতে এসেছেন। সন্ধেবেলা ওই ফ্ল্যাট বাড়ির দ ারোয়ান বাহাদুর ওঁকে একটা চিঠি দিয়ে যায়। চিঠিটা পাওয়ার পরের ঘটনাই নাটক।

কলিং বেল বাজে

নীপা – এই সন্ধের মুখে আবার কে এলো।

(দরজা খোলার আওয়াজ)

বাহাদুর। কী ব্যাপার? চিঠি আমার নামে! এই ঠিকানায়। খামের ওপর নামটাতো আমারই। আশর্চ্য।

(দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ)

বেশ মোটা ভারি খাম। কার হতে পারে চিঠিটা। ঠিকানাই বা পেল কী করে? আজ নিয়ে মাত্র তো ৯টা দিন এই নতুন ফ্ল্যাটে এসেছি। এখনও কাউকেই নতুন ঠিক ানা জানাইনি। শুধু দিদিভাই, মাসি সৌম্য, সোনা, রীমা আর অভিজিৎ। আর কেউ তো.....। সৌম্য, সোনা, রীমাদের মধ্যে কেউ মজা করে কিছু পাঠায়নি তো? খামের ওপরের লেখাটা কম্পিউটারের। এদের মধ্যে কম্পিউটার আছে খালি সৌম্যর। কিন্তু ও তো শিলিগুড়িতে।

তাছাড়া কাল রাত্তিরেই শিলিগুড়ি থেকে ফোন করেছিল। কিছু তো বলল না। চিঠি ছাড়া আবার অন্য কিছু নেই তো? কীই বা থাকতে পারে? কোনও কেমিক্য ালস পাঠিয়ে কেউ যদি ক্ষতি করবার চেষ্টা করে। আজকাল তো এরকম হচ্ছে। তবে মনে হয় না। খামকা কেউ আমার ক্ষতি করতে চাইবেই বা কেন? ছাত্রছাত্রীরা সবাই আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক বছরই শ'পাঁচেক নতুন ছেলেমেয়ে কলেজে আসে। তিন বছর ধরে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বকাঝকা মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই করি তা বলে দিদি খারাপ এ কথা কখনও কাউকে বলতে শুনিনি। কোনও দিনও কেউ আমাকে অসম্মান করেনি। তাহলে...। কাজে অকাজে কখনও যে পুষ মানুষের একটু আধটু হ্যাংলামি সহ্য করিনি এমন নয়। তা নিয়ে ছোটো খাটো সমস্যাও হয়েছে। আমার এই একা থাকা নিয়েই কথা কী কিছু কম? আত্মীয় অন াত্মীয় আড়ালে আবডালে বলেছে সবাই। শুভানুধ্যায়ী সেজে সুযোগ নেবারও চেষ্টা করেছে। না পেরে কত আজে বাজে কথা রটিয়েছে। অথচ যখন বাবা হঠাৎ চলে গেল তখন এদের কেউই কাছে ঘেঁষেনি, পাছে কোনও দায়িত্ব নিতে হয় তবে সে সব ঘটনায় এমন কিছু ছিল না যা থেকে এত দিন পর মনে হতে পারে যে কেউ হয়তো ক্ষতি করতে চাইছে। আমি বা এত ভাবছি কেন? খামটা খুলে দেখলেই তো হয়। কিন্তু সত্যিই যদি খারাপ কেমিকেলস্ বা ওই রকম কিছু থাকে?

আমি কি ভয় পাচ্ছি? যদি কেউ এখন আমার কাছে থাকতো তাহলে কি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, খামটা খুলবো কী না? যদি সে বলতো, না খুলো না। তাহলে.....

কারও উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে একটা জোর পেতে চাইছি আমি। কিন্তু কেন? আমার তো এরকমটা হওয়ার কথা নয়। ৪৮ বছর বয়েসের বেশিটাই তো কেটেছে একা। আজ হঠাৎ নতুন করে এত সব ভাবনা.....

যখন স্কুলে একটু ওপরের ক্লাশে পড়ি তখন থেকেই তো একা। দিদিভাইয়ের বিয়ের সময়ে আমার ক্লাশ নাইন। এম এ পাশ করে বজবজের কাছে একটা ছোট স্কুলে সবে জয়েন করেছি মা চলে গেল। মার খুব ইচ্ছে ছিল আমি পি এইচ ডি করে কলেজে পড়াব। আমাদের একটা ফ্ল্যাট হবে। ছোট্ট ব্যালকনি থাকবে। সাবেক পাঁচু মিত্তির লেনের বাড়িটা মার কোনও দিনও পছন্দ ছিল না। বিশেষ করে জ্যাঠামশাইদের ব্যবহার। বাবাকে প্রায়ই বলতো অন্য কোথাও থাকবো। মার সব স াধগুলো যখন পূরণ করলাম তখন মা কোথায়। আজ আমি যা হয়েছি যতটুকু করতে পেরেছি তা তো মার জন্যেই। বাবার সাধারণ চাকরীর রোজগারে কত কষ্ট করে মা সংসার চালাতো। তার মধ্যেই আমাদের দু বোনকে ভালো স্কুলে পড়িয়েছে। পড়াশোনার খরচ সামলাতে কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। নিজের কথা কখনও ভাবেনি।

মা যাওয়ার বছর না ঘুরতেই বাবা। দিদিভাইয়ের বিয়ের পরেই একা হয়ে গিয়েছিলাম। মা যেতে কিছুটা ছন্নছাড়া। তবু একটা পরিবারের শিকড় ছিল। বাবা যেতেই শিকড় ছেঁড়া। স্কুলে পড়ানো, টিউশানি, কালে ভদ্রে মাসি বা ছোটো পিসির বাড়ি।

মাঝে মাঝে রেডিও টি ভি-তে এক আধটা ছোটখাট অনুষ্ঠান করা। আজন্ম দেখা স্যাঁতস্যাঁতে ঘর দুটোর ডেও-ঢাকনার সংসারে নিজের সঙ্গে একা আমি নিজের মত ভালই ছিলাম। সত্যিই কি ছিলাম? কার সঙ্গে না জড়িয়ে এই যে নিজের মত বাঁচতে চাওয়া, সত্যিই কি তাই আমি চেয়েছিলাম? না চেয়েই বা কী করতাম? তেমন করে কেউ তো কখনও আমার সঙ্গে জড়াতে চায়নি। হয়তো কাউকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে অবশ্য.....। সেও তো অনেক বছর হয়ে গেল। পাঁচু মিত্তির লেনের এই পুরোনো বাড়িটাকে এত ভালোবাসি কখনও কী জানতাম। ছোট্ট বেলা থেকে মার সঙ্গে আমিও স্বপ্ন দেখতাম একদিন অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঘর দুটো ছেড়ে নতুন বাড়িতে চলে যাব। অথচ যখন প্রমোটারকে হ্যান্ডওভারের ফাইনাল এগ্রিমেন্টে সই করছি কোথা থেকে যে একদলা কান্না আপনিই বুক ঠেলে উঠে এসেছিল। ভালবাসা কখন কোথায় যে কার জন্যে লুকিয়ে থাকে। যে লুকিয়ে রাখে সেও জানে না, যার জন্যে লুকিয়ে রাখে সেও জানে না।

বাড়ি বিক্রির পরপরই কয়েক দিন সোনার কাছে। তারপর নিউ আলিপুরে লেডিস হস্টেল। লেডিস হস্টেলে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই স্কুল ছেড়ে কলেজে জয়েন করেছি। হঠাৎ মাস কয়েক আগে রীমাদের নতুন ফ্ল্যাটের গৃহ-প্রবেশে গিয়ে কী যে ঝোঁক চাপলো একটা ছোট ফ্ল্যাট নিজের জন্যে কিনতে হবে। যেমনি বলা ওমনি রীমা আর ওর বর অভিজিৎ খুঁজে পেতে দেড় মাসের মধ্যেই এই ফ্ল্যাটটা কিনিয়ে দিল। ওরা ছিল তাই। না হলে এত হুজ্জোত করে, হাউসিং লোন বার করে, ফ্ল্যাট কেনা, আমার দ্বারা হোত না।

কুরিয়ারে পাঠানো একটা চিঠির খাম এমন করে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

খামটা খুলি। দেখিই না কী আছে। একটা সামান্য চিঠি আসা নিয়ে শুধু শুধু এত আজে বাজে ভাবছিই বা কেন?

(খাম ছেঁড়ার আওয়াজ)
বা বাঃ এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়.....চিঠি কোথায়, এতো প্রায় একটা মহাকাব্য। কম্পিউটার প্রিন্ট আউটে সাড়ে বারপাতা। কিন্তু লিখলোটা কে? আর আমাকেই যে লিখেছে তাও তো বোঝবার উপায় নেই। প্রথম শেষ কোথাও কারও কোনও নাম নেই। শুধু তারিখটা রয়েছে গত কালের। হাতে লেখা চিঠি হলেও না হয় হাতের লেখা দেখে চেনবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কম্পিউটারের লেখায় বুঝবো কী করে। শুটাও যেন কেমন অদ্ভুদ খাপছাড়া। একেবারেই চিঠির মত নয়।
কাদা মাটি ঘেঁসের রাস্তাটা দিয়ে দেবদত্ত ইস্কুল যাচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেল। ইস্কুল যেতে গেলে সিধু কুমোরের বাড়ির উঠোনটা পেরোতে হয়। উঠোনের লাগোয়া খড়ের চালার দোকানঘরে রকামারি ঘট, হাঁড়ি, কলসির সঙ্গেই থাকে কয়েকটা মাটির পুতুল। ইস্কুল যাওয়ার সময় রোজই সিধু কুমোরের ছেলে মেয়েদের কেউ না কেউ দাওয়ার ওপর এক ফালি ট্যারচা রোদ্দুরে নতুন রং মাখানো পুতুলগুলো শুখোতে দেয়। ইস্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরবার পথে দেবদত্ত রোজ একটু দাঁড়িয়ে পুতুলগুলোকে দেখে।
নীপা – দেবদত্ত নামে কখনও কাউকে চিনতাম বলে তো মনে পড়ছে না। আচ্ছা উটকো ফ্যাসাদে পড়লাম। লেখাটা যে পাঠিয়েছে সে কি আমাকে চেহারায় চেনে, না শুধু নামটাই জানে? বুঝতেই পারছি না ঠিকানাটা পেলো কী করে? প্রত্যেক প্যারার প্রথম লাইন কটা বরং পড়তে পড়তে যাই। যদি কোনও ভাবে বুঝতে পারি কে লিখেছে।

স্কুল থেকে ফেরবার সময়ে রোজ যেমন দাঁড়ায় তেমনই দাঁড়িয়ে পুতুলগুলোকে দেখছিল। দেবদত্ত। হঠাৎ সিধু কুমোর রোদ পোহানো পুতুলগুলোর তদারকি করতে করতে দেবদত্তকে জিজ্ঞেস করে 'কী একটা পুতুল চাই।' দেবদত্ত কিছু বলতে পারে না। এমনিতেই ওর প্যান্টের পকেটে তিনটে কাচের গুলি আর একটা হাতলাট্টু ছাড়া কিছু নেই , তায় ও মেয়ে নয়। মেয়ে হলে তবেই না পুতুল কিনতে চাওয়া যায়। সিধু কুমোর কী বুঝলো কে জানে চূড়ো করে চুল বাঁধা গোলগাল টানা চোখের পুতুলটা রোদ থেকে তুলে ওকে দিয়ে দিল। পুতুলটা হাতে ধরতেই কেমন যেন একটা ঠান্ডা শিরশিরিনি বেয়ে নেমে গেল। এক ছুটে প্রায় ভাসতে ভাসতে বাড়ির সামনে এসে বুঝতে পারল একটা সমস্যা আছে। নতুন আস্ত পুতুল ওকে সিধু কুমোর এমনি এমনি দিয়েছে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তার ওপর সকলের চোখের সামনে পুতুল নিয়ে খেললে..। দেবদত্ত বুঝতে পারে না পুতুলটাকে নিয়ে কী করবে।

নীপা – কী আবার করবে এদিক সেদিক দেখে আপাতত কোথাও লুকিয়ে রাখবে। তারপর দু পাঁচ দিন গেলে হয় পুতুলটা ভাঙবে নয়ত হারাবে। তাছাড়া কদিন পর পুরোনো হলে আপনি ওই সব পুতুলের মায়া ফায়া কেটে যাবে। বলে জ্যান্ত মানুষের স্মৃতি লোপাট হয়ে যাচ্ছে। আবার মাটির পুতুল নিয়ে আদিখ্যেতা। কে এটা? যত্ত সব বস্তা পচা প্যানপ্যানানি। এই জন্যেই এখনকার ছেলেপুলেগুলো বাংলা গল্পের বই টই পড়তে চায় না।
এই উপন্যাস্যের খসড়া আমাকে পাঠানো কেন? আমি তো আর কোনও পত্রিকার সম্পাদক নই যে পছন্দ হলেই ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেবো। একটা কারণ অবশ্য থাকতে পারে। মাস কয়েক আগে টি ভি-তে শারদ সংখ্যা নিয়ে কয়েকজন পত্রিকা সম্পাদকের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। সেই সূত্র ধরে কী কেউ.... ?
ব্যাপারটাকে যেন বড় বেশি গুত্ব দেওয়া হয়ে যাচ্ছে? চিনি না শুনি না কেউ একটা কিছু পাঠিয়ে দিল আর আমিও তাই নিয়ে ভাবতে বসে গেলাম। যত সব বাজে। তার থেকে বরং ক্যাসেট শুনি। আসা পর্যন্ত সাউন্ড সিস্টেমটা একবার চালিয়েও দেখা হয়নি যে নতুন পয়েন্টে চলছে কি না। এদিক সেদিক একটু আধটু গোছগাছ করতে না করতেই দিন শেষ।
( টেপ রেকর্ডার অন করবার জন্য সুইচ টেপার শব্দ হবে। একটা গান কিছুক্ষণ চলার পর কথা ওভারল্যাপ করবে।)

নাঃ একটু চা করা দরকার, চিঠি চিঠি করে মাথাটাই কেমন ভার হয়ে গেছে। মাইক্রোওভেনেই জলটা বসিয়েছি। বেশ মজাও লাগছে। কোথাকার কে একজন কী এক লেখা পাঠিয়েছে সেটাকে নিয়ে এই ভর সন্ধে বেলা কাজ কম্ম ছেড়ে বসে আছি। এমনই অবস্থা যে বুঝতেও পারছি না লেখাটা কার? যে লিখছে সে মহিলা না পুষ। যদি লেখাটা কার আত্মজীবনীর অংশ হয় তাহলে লেখকটি পুষ। কিন্তু যদি কোনও গল্পের খসড়া হয় তাহলে তা কোনও লেখিকারও হতে পারে। দেখি আরেকটু এগিয়ে যদি কিছু একটা আন্দাজ করা যায়।
আগে বরং চাটা ছেঁকে নিয়ে আসি। তারপর লেখাটাতে চোখ বোলাব।
নাঃ সে রকম কিছু তো দেখছি না। কোনোও আধা মফস্বলে একটা মাটির পুতুলকে ঘিরে কার সাধারণ ছেলেমেলার গল্প এরকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই জায়গাটা কেমন একটু অন্যরকম। যেন একটা অন্য সুর। পুরো প্যারাটা একবার পড়ে দেখি।
যবে থেকে এখানে এসেছি তখন থেকেই হয় দুপুরে নয় তো মাঝরাতে বোমা, পিস্তল, পাইপগান, আর পুলিশের ভারি বুটের দাপাদাপির আওয়াজ শুনছি। মা কাল রাতে বাবাকে এই গুলিগোলা আওয়াজের কথা বলছিল। শুনে বাবা বলছিল এই শব্দগুলো আছে বলেই নাকি মাত্র দেড়শো টাকায় একটা আস্ত ঘর আমরা ভাড়া পেয়েছি। এখানে আমাকে অনেক রকমের বারণ মেনে চলতে হয়। বাবার বারণ কোথায় যাবো না। সেজ মামার বারণ কার কার সঙ্গে মিশবো না। মার বারণ সন্ধে হবো হবো হলেই আর বাড়ির বাইরে থাকা যাবে না। যখন হিদিপুরে থাকতাম তখন বারণের কোনও ঘেরাটোপই ছিল না।
কলকাতাতে এসে দেখছি কী করতে পারবো তার থেকে কী করতে পারবো না সেই ভারটা অনেক বেশি। গলির শেষ বাড়িটার এবরো খেবরো দেওয়ালে, ইস্কুলের আশেপাশে, সেজ মামার বাড়ির রাস্তায়, সর্বত্র কালো আলকাতরা দিয়ে কারা সব লিখে রেখেছে 'সত্তরের দশক মুক্তির দশক'। কোথাও কোথাও আবার এই লেখার সঙ্গে কেমন এক অদ্ভুত টুপি পড়া গম্ভির মুখের ছবি। নিচে লেখা 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। আবার কোথাও ছবির নিচে শুধু লেখা 'কমরেড মাও সে তুঙ'।

নীপা – এতো আমারও স্কুলে পড়বার সময়। সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। দু তিনটে পেপার তখনও বাকি। একদিন হঠাৎ গোপাদের বাড়িতে পুলিশ। কী ব্যাপার না গোপাদের বাড়িওয়ালার ছেলে গদাইদা নাকি নকশাল হয়ে গেছে। ওর খোঁজে পুলিশ এসেছে। গদাইদাকে অবশ্য পায়নি। কিন্তু ওদের বাড়ি এমন কী নিচে ভাড়াটেদের ঘরদোরও লন্ডভন্ড করে দিয়েছিল। গোপা তখন ওর মাসির ল্যান্সডাউনের বাড়ি থেকে বাকি পরীক্ষা কটা দিল। সেই থেকে কত দিন ভয়ে আর গোপাদের বাড়ির ধারই মাড়াইনি। মাস কয়েকের মধ্যে অবশ্য গোপারাও ওই বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। সে একটা সময় গেছে বটে। আজ কত বছর পর হঠাৎ গোপার কথা মনে পড়ল। হায়ারসেকেন্ডারি পাশ করেছি তিরিশ বছর হয়ে গেল। গোপার নাম তবু মনে পড়ল। বছর পাঁচেক আগে একবার মেট্রোতে দেখা হয়েছিল। ওই প্রথম চিনেছিল। স্কুলের বন্ধুদের কথা কবেই ভুলে গেছি। দেখি পরের প্যারাটা।

সত্তর দশক মুক্তির দশক। এই মুক্তিটা যে কী আমি সেদিনও বুঝতাম না, আজও বুঝতে পারি না। আমাদের তখনকার ভাড়াবাড়ির চার ঘর ভাড়াটের একটা কলতল

া। প্রত্যেকের চানঘরে ঢোকবার বেরোবার সময় নির্দিষ্ট করা আছে। বড় চৌবাচ্চার পাশে একটা নিচু কল ছিল। ছোট বালতি বসিয়ে কয়েকজন ওই বাইরের কলেও চান করতো। আমি কিছুতেই বাইরে দাঁড়িয়ে খালি গায়ে চান করতে চাইতাম না। এর জন্যে পাশের ঘরের রমাপিসি আমাকে মেয়ে মেয়ে বলে খ্যাপাত। অথচ যখন হিদিপুরে থাকতাম তখন খোলা আকাশের নিচে পাতকুয়োর জল হুরহুরিয়ে গায়ে ঢেলেই চান করতাম।
নীপা – এটুকু পড়ে একটা জিনিস পরিষ্কার যে লেখাটা প্রায় আমারই কাছাকাছি বয়সী কোনও পুষের। কিন্তু কে হতে পারে?
আগে হিদিপুরে থাকতো এরকম কাউকে তো চিনি বলে মনে হচ্ছে না। হিদিপুর বলে কোনও জায়গার নামই কখনও শুনিনি। আবার এমনও হতে পারে। হিদিপুর নামটা বানানো। আসল নামটা লেখেনি। সে যাকগে তারপর দেখি কী লিখেছে।

হায়ারসেকেন্ডারি পরীক্ষার পর তিন মাস নিশ্চিন্ত। চান খাওয়ার অত তাড়া নেই। তাই চানের সময়টা বদলে নিয়েছি। সাড়ে বারোটার পর আমার সময়। একটু বাড়তি সময় খরচ করলে ক্ষতি নেই। চানঘরের স্যাঁতস্যাঁতে তিনটে দেওয়াল আর একটা ক্যানেস্তারার টিন সাঁটা দরজার আড়ালে, শ্যাওলা ছেটা মেঝের ওপর, সর্বাঙ্গে জল মাখা শরীরে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে টিনের চালের ছোট্ট ফুটোর মধ্যে আকাশের রং। আকাশের এই রঙেওতো আছে হিদিপুরের বড় আকাশটার রং। যে আকাশের নিচে জুট মিলের নতুন মালিক মিলের সঙ্গে আমাদের মত কয়েক 'শ পরিবারের পুরো স্বপ্নগুলোকেই কিনে নিয়েছিল অনায়াসে। দেওয়ালে দেওয়ালে কাল আলকাতরার লেখা মুক্তির দশকের ডাক। মুক্তির ছবিতে মুক্ত আকাশের রং কেমন কে জানে?
নীপা – একটা জ্বালা আছে লেখাটার মধ্যে। কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? এম এ-তে একটা ছেলে প্রাইভেট ক্যানডিডেট ছিল। মাঝে মাঝে পারমিশন নিয়ে আমাদের ক্লাশে আসতো। নামটা সৌমিত্র বা সুব্রত এরকম একটা কিছু হবে। ছোটবেলায় ওই ছেলেটা একটা আধা মফস্বল ইন্ডাসট্রিয়াল বেল্টে থাকতো শুনেছিলাম। কবিতা লিখত। আমাকে নিয়ে একবার একটা কী লিখেছিল। ওরকম বয়েসে কোনও ছেলে কোনও মেয়েকে নিয়ে কবিতা লিখলে ওপরে রাগ দেখালেও ভেতরে ভেতরে মেয়েটার ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু আমার লাগেনি। সত্যিই বিরক্ত হয়ে দু কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। এতদিন পরে আবার ও নয়তো? ধ্যুস পঁচিশ বছর পর হঠাৎ ও কোথা থেকে আসবে। কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। বাদসাধ দিয়ে পড়ে তো প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি অথচ এখনো কার লেখা হতে পারে তাই আন্দাজ করতে পারছি না। দেখা যাক আরেকটু এগিয়ে যদি কোনও হদিশ খুঁজে পাই।

সেটাই বোধহয় কলকাতায় চলচ্চিত্র মেলার প্রথম বছর। নভেম্বরের মাঝামাঝি শীত তো নেই। সন্ধ্যের একটা মিষ্টি শিরশিরিনি। নন্দন রবীন্দ্রসদনের চত্বর রঙবেরঙের নিশান আর পারাবাষ্পর আলোয় ঝলমল করছে। আকাদেমির দেওয়াল ঘেঁসে ত্রিপল টাঙানো চায়ের দোকান। রবীন্দ্রসদনের টিকিট ঘর, হরেক ড্রাইফুডের দোকান নিয়ে জমজমাট ভিড়। এই ভিড়ে মিশে দেবদত্ত হঠাৎ ওকে দেখল। বদলেছে অনেক তবে চেনা যায়। লাল রঙের মাঝ দরজার বাস এসেছে। ও উঠলো। বাসটা চলে গেল। ভিক্টোরিয়ার পরি। প্ল্যানেটোরিয়ামের অন্ধকারে স্বপ্ন ঘোর। সেন্ট পলস্ গির্জার নরম ঘাসে এক পশলা বৃষ্টির আঁচর। স গলির শেষে এক ফালি উঠোন ডিঙোনো ছোট্ট ঘরে দিন চোঁয়ানো আলোয় স্বপ্ন চোখের সেই মেয়ে। সামনে দাঁড়িয়ে অবাক করে দেওয়া দৃষ্টিছাটে ভিজিয়ে দেবদত্ত বলতে পারল না 'চিনতে পারো'। বারটা বছর, সময়ের হিসেবে বড় লম্বা।

নীপা – দৃষ্টিছাটে ভিজিয়ে। ভারি সুন্দর শব্দ তো। লেখাটা যারই হোক এই জায়গাটা ভারি সুন্দর। একটা ইমোশনাল টাচ আছে। কিন্তু আমার এই ঠিকানাটা জানে তেমন কার কথা মনে পড়ছে না যে এরকম লেখা লিখতে পারবে। অথচ। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল। সেই কথায় বলে না 'না পারছি গিলতে না পারছি ওগরাতে', আমার এখন সেই অবস্থা। কে যে লিখল আর কেনই বা লিখল কিছুই বুঝতে পারছি না। না বুঝতে পারার জন্যে রাগও হচ্ছে আবার দূর হোকগে ছাই বলে ফেলেও দিতে পারছি না। শেষ দুটো পাতা অবশ্য এখনও দেখা হয়নি। দেখি একবার চোখ বুলিয়ে যদি কিছু বোঝা যায়। গোটা লেখাটা পুরো পড়লে হয়তো সুবিধে হত। কিন্তু এখন এত বড় লেখা পড়ে দেখবার ধৈর্য নেই।
পেছনে দলা পাকানো ডিজেল পোড়া ধোঁয়ার কুন্ডলি ছড়িয়ে বাসটা চলে গেল। খালি ভাঁড়াটা পায়ের চাপে ভেঙে দেবদত্ত পি জি-র দিকে পা বাড়ায়। আলগোছে হাঁটতে হাঁটতে এলগিন পেরিয়ে যায়। আর সামান্য একটু গেলেই হরিশ পার্ক। এমনও হতে পারে ও নয়। আষ্টেপৃষ্ঠে চালশের ভার মাখা ওই মহিলার সঙ্গে ওর কিছুটা চেহারার মিল আছে, এই পর্যন্ত। সামনাসামনি দেখেছি তো এক ঝলক। বাকি যেটুকু সে তো নিজেকে আড়ালে রেখে কোনাকুনি। এতদিন পর এভাবে চেনা যায় নাকি? বিশেষ করে মেয়েদের।
নীপা – কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালের প্রথম বছর মানে কী নাইনটি ফাইভ? ওই সময়টাতে কঙ্কনা আমার কাছে পড়ত। ওর বাবা পুলিশে ছিলেন। ও তখন মাঝে মাঝে দু একটা ছবির ডে কার্ড দিয়েছে। তাহলে কি আমাকেই বাসে উঠতে দেখছে? কিন্তু দেবদত্ত নামের আড়ালে কথাগুলো যে বলছে, সে কে? সেটাই তো ধরতে পারছি না। একেবারে শেষটায় গিয়ে দেখি তো যদি কোনও সূত্র খুঁজে পাই। শেষ প্যারাটা দেখছি আবার লেখা হয়েছে অন্য একটা টাইপফেসে। পয়েন্টা টাও একটু ছোট। তাহলে কী এই অংশটা দেবদত্ত, পুতুল, মুক্তির দশক, এসব থেকে আলাদা। দেখি তো পড়ে।

তিন সপ্তাহ আগে পেরিয়ে গেলাম। তাতে লাভ একটাই ধরা বাঁধা ৯টা ৫টার চাকরী থেকে অবসর মিলেছে। নিজের বেলায় লক্ষ করে দেখেছি কোনও কিছুতে লাভ যখন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে একটা ক্ষতির আশঙ্কাও ঠিক চলে এসেছে পেছন পেছন। তাই লাভের হিসেব কষবার আগে ক্ষতিটা কী সেটা খুঁজে দেখার একটা অভ্যেস আছে আমার। এবার খুঁজতে গিয়ে দেখি একটা নতুন অস্থিরতার জন্ম হয়েছে। যদিও কোনও দিন সুস্থির ছিলাম এ অপবাদ আমার অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না। আবার সেই জটিল ধাঁধা। কে শত্রু আর কে মিত্র? যেই কাউকে প্রিয় সুহৃদ সব থেকে বড় মিত্র ভাবতে শু করলাম অমনি গন্ডগোল। কোথ্থেকে উড়ে এলো এক ঝড়। সেই ঝোড়ো হাওয়ায় কত ওলট পালট। অবসর যত বড় এই ঝোড়ো হাওয়ার দাপটটাও তত বেশি। যাক সে কথা। যে জন্যে এতক্ষণ ধান ভাঙলাম সেই শিবের গীতটা এবার গেয়ে ফেলি। কাল রাত সোয়া আটটা বাজলেই এই শহরের সঙ্গে একেবারে আড়ি। বয়েস বাড়লেই নানা উটকো ঝামেলা। প্রেসার গাউট গ্যাসট্রিক সুগারের সঙ্গে এসে জোটে অনভ্যেসের কোনও বদল দেখলেই একটা তিরিক্ষে খ্যাঁচড়ানো মেজাজ। এই সত্যিটা লক্ষ করেছিলাম ছোট বয়েস থেকেই। তাই ষাট পেরনো অবসর এলে কলকাতা থেকে অনেক দূরে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে নতুন জায়গায় নতুন কিছু করবার চেষ্টা করবো এরকম একটা ইচ্ছের কথা বছর বাইশ আগে দুজনকে বলেছিলাম। কিন্তু এখন ইচ্ছাপুরণের খবরটা দিতে পারব একজনকেই। কারণ আরেকজন মাস কয়েক আগে অন্য ঠিকানায় চলে গেছে। যাওয়ার সময়ে পৃথিবীর চৌহদ্দি ডিঙানো নতুন ঠিকানাটা আমাকে জানিয়ে যেতে পারেনি। এই ঠিকানাটাও জানবার কথা ছিল না। তাই পুরোনো ঠিকানায় পাঠানো চিঠি রিডাইরেক্ট হয়ে অনেক দিন পর অনেক হাত ঘুরে হয়তো একদিন প্রাপকের কাছে পৌঁছবে না। এরকমটাই হবার কথ।

নীপা – ষাট বছর বয়েস হলে রিটায়ারমেন্টের পর দূরে কোথাও চলে যাব 'বাইশ বছর আগে কেউ আমাকে এমন কিছু বলেছিল বলে তা মনে পড়ছে না। খুব

চেনা কেউ নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা পেয়ে মজা করেছে বলেই মনে হচ্ছে। তবু আরেকটু দেখি।

যাবার বেলা দিনক্ষণ দেখে বলে কয়ে তবেই যেতে হবে এমন দায় বা তাগিদ ছিল না। তবে একটা ইচ্ছে হয়তো লুকিয়ে ছিল কোথাও। না হলে গত রবিবার মাঝ বিকেলে হঠাৎ নানুর দোকানের পাশে তপেনের নতুন ফ্ল্যাট বাড়ির তিন তলার বারান্দায় পঞ্চাশ ছোঁয়া ভারিক্কি চেহারার এক মানবী মূর্তি দেখেই মনে পড়বে কেন বর্ষা ভেজা দুপুর, বছর ছাব্বিশের রোগাটে শ্যামলা মেয়ের চোখের কোণে মজা নদীর দুকূল ভাসা স্রোত, ভরাকোটালের গান, ফ্যাকাসে কাঁপা ঠোঁটে কান জুড়ে ান সুর ‘ আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না তো ’।

নীপা – অনিন্দ্ধ। এত বছর পর। কোথা থেকে?
(ইলেকট্রনিক ঘড়িতে ঘন্টা বাজে)
আটটা বাজলো। ওপরে লেখা তারিখটার হিসেবে আর ১৫ মিনিট পর ওর চলে যাওয়ার কথা। যদি জানতাম ট্রেনের নাম, কোচনম্বর, ব্যর্থ তাহলে? একটু চাপেই তো মর্চে ধরা কুড়িটা বছর ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ত। শেষ কম্পার্টমেন্টের পেছোনে লাগানো টেললাইটের আলো ছোট হতে হতে একটা রক্তবিন্দু হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ডিসট্যান্ট সিগনালের রঙটা বদলে ততক্ষণে আবার আগের মতই লাল। তবু যদি যেতাম যদি খুঁজে পেতাম। বলতে পারতাম? অনিন্দ্ধ তোমার দেবদত্তকে বোলো নদীর স্রোত মোহনার দিকেই বয়ে যায় সে কখনো উৎসে ফেরে না। পুতুল ভাঙা মাটির টুকরো জুড়ে কি ফেলে আসা সময়ের কাছে ফেরা য ায়? চানঘরের টিনের চালের ছোট্ট ফুটোর মধ্যে আটকে যাওয়া আকাশের কোনও রঙ থাকে না।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com